চার

বঙ্গবন্ধুর নীতি-আদর্শ ও নেতৃত্ব

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে চার বিশিষ্টজন যথা: স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পিতা শেখ লুৎফর রহমান, তাঁর রাজনীতির প্রাণপুরুষ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও সাংবাদিক-লেখক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এঁদের প্রভাব বা ভূমিকা কি ছিল, তা আমরা দেখেছি। *আত্মজীবনী*তে এ ছাড়াও তাঁর নেতৃত্ব, নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ, বাঙালির ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি-কৃষ্টির প্রতি বঙ্গবন্ধুর একাগ্রচিত্ততা, তাঁর রাষ্ট্রভাবনা, ইতিহাস চেতনা, কারাস্মৃতি, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য, ভাষা-আন্দোলন, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় নানাভাবে স্থান পেয়েছে। এ অধ্যায়ে *আত্মজীবনী*র আলোকে তাঁর নীতি-আদর্শ ও নেতৃত্বের স্বরূপ তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালি। বাংলার নদী, বাংলার জল, বাঙালির খাবার, বাংলার ফল, বাংলার গান, বাংলার সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা উর্বর জমি আর নৈসর্গিক সৌন্দর্য তাঁকে সর্বদা মুগ্ধ করতো। একবার এক অনুষ্ঠান শেষে ঢাকার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বাংলার শ্রেষ্ঠ লোকসংগীত শিল্পী আব্বাসউদ্দিনসহ নৌকাযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আশুগঞ্জ আসছিলেন। পথে আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে ভাটিয়ালি গান শুনে তিনি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি লিখেন:

> নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে। ... আমি আব্বাসউদ্দিন সাহেবের একজন ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১১১)।

শান্তি সম্মেলন উপলক্ষে একবার মাও সে তুং-এর দেশ গণচীনে গিয়ে (১৯৫২) লেকে নৌকা বাওয়ার অনুভূতি তিনি এভাবে ব্যক্ত করেন:

> হ্যাংচো ও ক্যান্টন দেখলে মনে হবে যেন পূর্ব বাংলা। সবুজের মেলা চারিদিকে ... নৌকা ছাড়া বর্ষাকালে এখানে চলাফেরার উপায় নাই ... আমি নৌকা বাইতে জানি, পানির দেশের মানুষ। আমি লেকে নৌকা বাইতে শুরু করলাম (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২৩৩)।

অপরদিকে, একই বছর পাকিস্তানের রাজধানী করাচি ভ্রমণকালে সেখানকার ভূ-প্রকৃতি দেখে তাঁর মনে যে ভিন্ন অনুভূতি হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু তাঁর *আত্মজীবনী*তে লিখেন:

> আমি এই প্রথম করাচি দেখলাম ... আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সবুজের দেশে, যেদিকে তাকানো যায় সবুজের মেলা। মরুভূমির এই পাষাণ বালু আমাদের পছন্দ হবে কেন? (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২১৪)।

অনুরূপভাবে, বাঙালি খাবারের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আসক্তির কথা তাঁর বিভিন্ন ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা বর্ণনা থেকে জানা যায়। ১৯৪৯ সালে একবার সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তিনি পশ্চিম পাকিস্তান যান এবং এক মাসের মত সেখানে ছিলেন। একটি মামলা পরিচালনার জন্য সোহরাওয়ার্দী তখন পাঞ্জাবের লাহোরে অবস্থান করছিলেন। 'ঢাকায় ফিরে এলে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করবে, আর লাহোরে থাকলে নাও করতে পারে' সোহরাওয়ার্দী বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে এমন কথা বললে, উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন:

> .... যা হবার পূর্ব বাংলায় হোক, পূর্ব বাংলার জেলে ভাত পাওয়া যাবে, পাঞ্জাবের রুটি খেলে আমি বাঁচতে পারব না। রুটি আর মাংস খেতে খেতে আমার আর সহ্য হচ্ছে না (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১৪২)।

তিনি তাঁর *আত্মজীবনী*র অন্যত্র লিখেছেন, 'বাংলাদেশের খাবার না খেলে আমার তৃপ্তি কোনোদিনই হয় নাই' (পৃ. ২২৮)। বঙ্গবন্ধুর বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস সচেতনতা ছিল খুবই তীক্ষ্ণ ও সুগভীর। বিভিন্ন সময়ে তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতিতে এর প্রকাশ ঘটে। ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ ও অগণিত মানুষের মৃত্যু সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেন:

> যুদ্ধ করে ইংরেজ, আর না খেয়ে মরে বাঙালি; যে বাঙালির কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখল করে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল যে, একজন মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারত (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১৮)।

*আত্মজীবনী*র অন্যত্র লিখেছেন:

> সুজলা, সুফলা বাংলাদেশ সম্পদে ভর্তি। এমন উর্বর জমি দুনিয়ায় খুব অল্প দেশেই আছে। তবুও এরা গরিব। কারণ, যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজকে এরা চেনে না, আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না (পৃ. ৪৮)।

রাজনৈতিক চেতনা বা বিশ্বাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুরু থেকেই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। হিন্দু প্রধান গোপালগঞ্জ মহকুমা (বর্তমানে জেলা) শহরে তাঁর বাল্যকাল কাটে। সেখানকার মিশন স্কুলে ৭ম শ্রেণী থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত (১৯৩৭-১৯৪২) তিনি লেখাপড়া করেন। সহপাঠী, খেলাধুলার সাথীদের মধ্যে অনেকে ছিল হিন্দু। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, '....আমার কাছে তখন হিন্দু-মুসলমান বলে কোন জিনিস ছিল না' (পৃ. ১১)। তবে কৈশরের অন্তত দু'টি ঘটনা তাঁর মনে গভীর দাগ কাটে, যার উল্লেখ তিনি তাঁর *আত্মজীবনী*তে করেছেন। একটি ১৯৩৮ সালের ঘটনা। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এঁদের গোপালগঞ্জ আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য তাঁর নেতৃত্ব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়েছিল। কংগ্রেস থেকে নির্দেশ আসায় হিন্দু ছাত্ররা এক এক করে তা থেকে সরে পড়ে। এমনকি বিরূপ সংবর্ধনারও তারা চেষ্টা করে। অপরটি হলো, তাঁর এক বন্ধু ননীর কাকার বাসার ঘটনা। একদিন ননী বঙ্গবন্ধুকে তার কাকার বাসার ভেতরে থাকার ঘরে নিয়ে বসায়। বঙ্গবন্ধু চলে আসার পর ননীর কাকীমা মুসলমান সন্তানকে অন্দরমহলে নিয়ে আসার জন্য ওকে বকাবকি করে এবং পানি দিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে বাধ্য করে। এ ঘটনা জানার পর বঙ্গবন্ধুর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাঁর *আত্মজীবনী*তে তিনি এভাবে তা তুলে ধরেন, 'এই ধরনের ব্যবহারের জন্য জাতক্রোধ সৃষ্টি হয়েছিল বাঙালি মুসলমান যুবকদের ও ছাত্রদের মধ্যে' (পৃ. ২৩)।

অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ও নেতৃত্বের কারণে বঙ্গবন্ধু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজী সুভাষ বসুর ভক্ত হয়েছিলেন (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২৪, ৩৫-৩৬)। মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী ত্যাগী ও কারানির্যাতন ভোগকারী হিন্দু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রসঙ্গ টেনে লিখেন:

> জীবনভর কারাজীবন ভোগ করেছে, ইংরেজকে তাড়াবার জন্য। এই সময় যদি এই সকল নিঃস্বার্থ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ত্যাগী পুরুষরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমানদের মিলনের চেষ্টা করতেন এবং মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার ও জুলুম হিন্দু জমিদার ও বেনিয়ারা করেছিল, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন, তাহলে তিক্ততা এত বাড়ত না (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২৩-২৪)।

একথা ঠিক যে, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে দেখেছেন বাংলা ও ভারতের শোষিত-বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উপায় হিসেবে। অসাম্প্রদায়িক আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন বলে ১৯৪৬ সালে কলকাতা দাঙ্গার (Great Calcutta Killing) সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন রক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন (*আত্মজীবনী*, পৃ. ৬৪-৬৮)। ভারত বিভাগের পর অন্য অনেকের মত সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে পাকিস্তানে ফিরে না এসে, মহাত্মা গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কলকাতায় তাঁদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রচেষ্টায় গৃহীত শান্তি মিশনে যোগ দেন (পৃ. ৮১)। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' এবং ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন তাঁর কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' এ দু'টো সংগঠনের নামের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দটি যুক্ত করাটা ছিল বিদ্যমান পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কৌশল মাত্র। বঙ্গবন্ধু আওয়ামী মুসলিম লীগের নামকরণের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে ব্যক্ত করেন:

> আমি মনে করেছিলাম, পাকিস্তান হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে, যার একটা সুষ্ঠু ম্যানিফেস্টো থাকবে ...তাই যারা বাইরে আছেন তারা চিন্তাভাবনা করেই করেছেন (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১২১)।

একই বিষয়ে বইয়ের অন্যত্র বঙ্গবন্ধু বলেন:

... এখনও সময় আসে নাই। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দেশের আবহাওয়া চিন্তা করতে হবে। নামে কিছুই আসে যায় না। আদর্শ যদি ঠিক থাকে, তবে নাম পরিবর্তন করতে বেশি সময় লাগবে না (*আত্মজীবনী*, পৃ. ৮৯)।

উল্লেখ্য, তাঁরই উদ্যোগে ১৯৫৩ সালে ছাত্রলীগ ও ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ দু'টো প্রতিষ্ঠানের অসাম্প্রদায়িক নামকরণ করা হয়।

অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক বিশ্বাসে বঙ্গবন্ধু যে সর্বদা অবিচল ছিলেন, ১৯৫০ সালের শেষের দিকে ফরিদপুর কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় গোপালগঞ্জের সহবন্দি, সমাজকর্মী চন্দ্রঘোষের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতা থেকে তা স্পষ্ট জানা যায়। 'মানুষকে মানুষ হিসেবে' দেখার চন্দ্র বাবুর উপদেশের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন:

চিন্তা করবেন না, আমি মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিষ্টান বলে কিছু নাই। সকলেই মানুষ (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১৯১)।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক বিশ্বাসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, জনগণের শোষণ মুক্তি। বঙ্গবন্ধুর কথায়, 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো।' সে বিশ্বাস ধারণ করে স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৭২ সালের সংবিধানে তিনি 'সমাজতন্ত্র'কে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। পূর্ব কোন নীতিগত অবস্থান ছাড়া হঠাৎ করে এ নীতি অবলম্বন করা হয়েছে বলে কেউ কেউ সেদিন বঙ্গবন্ধুর সামালোচনা করেন। তবে এ সমালোচনা যে ভিত্তিহীন ছিল, *আত্মজীবনী*তে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন, পশ্চিমের অবাধ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নয়। নয়া চীন ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি তাঁর এ আদর্শিক অবস্থান এভাবে ব্যক্ত করেন:

... আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২৩৪)।

আর এই বিশ্বাসের কারণে বঙ্গবন্ধু দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন, 'বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত—শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।'[১]

ত্যাগের ব্রত নিয়ে বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করেন। রাজনীতিকে দেখেছেন দেশ ও জনগণের কল্যাণ হিসেবে। এ সম্বন্ধে তিনি *আত্মজীবনী*তে লেখেন:

যে কোনো মহৎ কাজ করতে হলে ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন। যারা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয় তারা জীবনে কোন ভাল কাজ করতে পারে নাই—এ বিশ্বাস আমার ছিল (পৃ. ১২৮)।

একবার পাকিস্তানে এক মাস কাটানোর পর গোয়েন্দাদের নজর এড়িয়ে বহু কষ্টে বঙ্গবন্ধু বাড়িতে এসে পৌছেন। সপ্তাহ দুই সেখানে থেকে ঢাকা আসার পর পর তিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য নিরাপত্তা আইনে বন্দি থাকেন। এমনটি যে ঘটবে তিনি তা পূর্বেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। বাড়ি ছেড়ে ঢাকা আসার মুহূর্ত ও সে সময়কার তাঁর অনুভূতি বঙ্গবন্ধু এভাবে প্রকাশ করেন:

... ছেলেমেয়েদের জন্য যেন একটু বেশি মায়া হয়ে উঠেছিল। ওদের ছেড়ে যেতে মন চায় না, তবুও তো যেতে হবে। দেশ সেবায় নেমেছি, দয়া মায়া করে লাভ কি? দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসলে ত্যাগ তো করতেই হবে এবং সে ত্যাগ চরম ত্যাগও হতে পারে (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১৬৪)।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের আর একটি দিক হলো, সারা বাংলায় নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা যারা, বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, 'আমার হুকুম পেলে আগুনেও ঝাপ দিতে পারত' (পৃ. ১০৬)। অপরদিকে, কর্মীদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অপরিসীম দরদ, স্নেহ ও ভালবাসা। তাদের সুখ-দুঃখের খবর তিনি রাখতেন। বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন, নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। দেশজুড়ে অগণিত নেতাকর্মীর নাম বিস্ময়করভাবে তাঁর মুখস্ত ছিল। *আত্মাজীবনী*তে উল্লিখিত এরূপ কয়েক শ' নাম এর প্রমাণ। বস্তুত কর্মীদের নিয়েই গড়ে ওঠেছিল বঙ্গবন্ধুর বৃহত্তর পরিবার। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রোজার সময় কর্মীদের নিয়ে ইফতার করা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ঢাকায় রোজার সময় জেলের বাইরে থাকলে আমি আওয়ামী লীগ অফিসেই কর্মীদের নিয়ে ইফতার করে থাকতাম' (পৃ. ২৭৫)।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন অসীম সাহসী। ভয়ডর বলতে তাঁর কিছু ছিল না। জীবনে বহুবার মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছেন। ১৯৩৮ সালে জীবনে প্রথম তাঁর ৭ দিন থানা হাজতে কাটানোর ঘটনা ঘটে। তখন তিনি গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। একটি হিন্দু পরিবারের সঙ্গে এক ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে থানায় এজাহার হয়। পুলিশকে আসতে দেখে তাঁর এক নিকট আত্মীয় তাঁকে পাশের বাসায় সরে যেতে বললে, তিনি প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন:

যাব না, আমি পালাব না। লোকে বলবে, আমি ভয় পেয়েছি' (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১২)। তিনি আর এক জায়গায় লিখেছেন, 'আমি পালিয়ে থাকার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না' (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১৩৪)।

তাঁর কৈশরের ঐ ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে স্বাধীনতাকামী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ ও তাঁর জীবনের নিরাপত্তার সমূহ আশঙ্কা জেনেও কেন বঙ্গবন্ধু সে রাতে তাঁর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসা থেকে আত্মগোপন করেননি। এমনকি, কিছু সময়ের ব্যবধানে (ঘড়ির কাটা অনুযায়ী ২৬শে মার্চ প্রত্যুষ) বাংলাদেশের সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণার পরও তিনি বাসা ছেড়ে যাননি, বরং পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তারবরণ করেন। জেল, জুলুম, নির্যাতন, দীর্ঘ কারাভোগ, জীবননাশের আশঙ্কা, কোন কিছুই বঙ্গবন্ধুকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট

মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ তাঁর মিন্টো রোডের বাসায় যায় (বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কো-অপারেটিভ ও এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রী ছিলেন)। বঙ্গবন্ধু তখন বাসায় ছিলেন না। বাসায় ফিরে এসে নিজেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ফোন করে বললেন:

> আমার বাড়িতে পুলিশ এসেছিল, বোধহয় আমাকে গ্রেফতার করার জন্য। আমি এখন ঘরেই আছি গাড়ি পাঠিয়ে দেন (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২৭১)।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো স্পষ্টবাদিতা। *আত্মজীবনী*তে তিনি এ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'আমার পেটে আর মুখে এক কথা। আমি কথা চাবাই না, যা বিশ্বাস করি বলি' (পৃ. ২১৮)।

তাঁর স্পষ্টবাদিতা সম্বন্ধে অনেক ঘটনা আলোচ্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা যায়। যেমন, একবার খুলনা জেলে বন্দি থাকাকালে জেলার সিভিল সার্জেন জেল পরিদর্শন করতে আসেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জেল অফিসে বসে আলাপ করছিলেন এবং শুরুতেই তাঁর জেল খাটা সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর *আত্মজীবনী*তে সে সম্বন্ধে লিখেন:

> আমি বসবার সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কেন জেল খাটছেন।" আমিও উত্তর দিলাম, "ক্ষমতা দখল করার জন্য।" তিনি আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "ক্ষমতা দখল করে কি করবেন?" বললাম, "যদি পারি দেশের জনগণের জন্য কিছু করব। ক্ষমতায় না যেয়ে কি তা করা যায়?" তিনি আমাকে বললেন, "বহুদিন জেলের সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে। অনেক রাজবন্দির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে... এভাবে কেউ আমাকে উত্তর দেয় নাই... আপনাকে ধন্যবাদ দিলাম" (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১৮৫)।

একবার গ্রেপ্তার হয়ে বঙ্গবন্ধু ১০ মাসের মত পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে বন্দি থাকেন। বন্ড দিয়ে মুক্তি না নেওয়া প্রসঙ্গে আইবি'র এক সদস্যকে উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন:

> দয়া করে ঘোরাঘুরি করবেন না। আমার সাথে দেখা করার ইচ্ছা থাকলে আসতে পারেন, তবে লিখে নিয়ে যান—আপনার উপরওয়ালাদের জানিয়ে দিবেন, বন্ড আমার দেওয়ার কথাই ওঠে না। সরকারকেই বন্ড দিতে বলবেন, ভবিষ্যতে আর এই রকম অন্যায় কাজ যেন না করে! আর বিনা বিচারে কাউকেও বন্দি করে না রাখে (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২৮১)।

১৯৫৪ সালের একটি ঘটনা। সোহরাওয়ার্দী মোহাম্মদ আলী বগুড়ার 'কেবিনেট অব ট্যালেন্টস' নামে খ্যাত কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, সোহরাওয়ার্দী যখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৪৬-৪৭), তখন মোহাম্মদ আলী তাঁর মন্ত্রিসভায় অর্থ, জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ছিলেন। এর পূর্বে নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভায় (১৯৪৩-৪৫) সোহরাওয়ার্দী যখন সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী ছিলেন তখন মোহাম্মদ আলী তাঁর পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেই মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় সোহারাওয়ার্দীর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। অধিকন্তু তাঁর কাছে এটি ছিল ষড়যন্ত্রের

অংশ। সোহরাওয়ার্দী বঙ্গবন্ধুর শুধু রাজনীতির দীক্ষাগুরুই ছিলেন না, তাঁকে পিতৃতুল্য বিবেচনায় শ্রদ্ধাও করতেন। তা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু তাঁর মনের অভিব্যক্তি অকপটে নেতার সম্মুখে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। করাচিতে দুজনের মধ্যে এভাবে কথপোকথন হয়:

> "গত রাতে এসেছ শুনলাম, রাতেই দেখা করা উচিত ছিল।" আমি বললাম, "ক্লান্ত ছিলাম, আর এসেই বা কি করব, আপনি তো এখন মোহাম্মদ আলী সাহেবের আইনমন্ত্রী।" তিনি বললেন, "রাগ করছ, বোধহয়।" বললাম, "রাগ করব কেন স্যার, ভাবছি সারা জীবন আপনাকে নেতা মেনে ভুলই করেছি কি না?" ... বললাম, "পূর্ব বাংলায় যেয়ে সকলের সাথে পরামর্শ করে অন্য কাউকেও তো মন্ত্রিত্ব দিতে পারতেন। আমার মনে হয় আপনাকে ট্র্যাপ করেছে। ফল খুব ভাল হবে না, কিছুই করতে পারবেন না। যে জনপ্রিয়তা আপনি অর্জন করেছিলেন, তা শেষ করতে চলেছেন" (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২৮৬)।

এভাবে নেতার মুখের ওপর সত্য কথা বলার দুঃসাহস ক'জনে রাখে? বর্তমান যুগে তো কথাই নাই।

বঙ্গবন্ধুর দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, যা যোগ্য নেতৃত্বের অন্যতম গুণ। এ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু লিখেন:

> আমি অনেকের মধ্যে একটা জিনিস দেখেছি, কোন কাজ করতে গেলে শুধু চিন্তাই করে। চিন্তা করতে করতে সময় পার হয়ে যায়, কাজ আর হয়ে ওঠে না .... আমি চিন্তাভাবনা করে যে কাজটা করব ঠিক করি, তা করেই ফেলি। যদি ভুল হয়, সংশোধন করে নেই (*আত্মজীবনী*, পৃ. ৮০)।

উপরন্তু, বসে বসে তত্ত্ব চর্চার চেয়ে নিজেকে কাজে নিয়োজিত করাকে তিনি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন কাজে বিশ্বাসী (Man of action)। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম বঙ্গীয় মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হওয়ার পর কলকাতা পার্টি অফিসে উঠেন এবং সেখানে রাতভর কর্মীদের রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন। কখনো কখনো ঐ সব ক্লাসে বঙ্গবন্ধু যোগদান করলেও, কিছু সময় পর আর থাকতেন না। এ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য:

> আমি আমার বন্ধুদের বলতাম, "তোমরা পণ্ডিত হও, আমার অনেক কাজ। আগে পাকিস্তান আনতে দাও, তারপরে বসে বসে আলোচনা করা যাবে"... কাজ তো থাকতই ছাত্রদের সাথে, দল তো ঠিক রাখতে হবে (*আত্মজীবনী*, পৃ. ৪১; আরো পৃ. ৩১)।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক নেতৃত্বের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি ছিলেন সব সময়ই বাস্তববাদী। রাজনীতিতে ঠিক যখন যে স্ট্যান্ড নেওয়া আবশ্যক, তখন তা নিতে পারা প্রাজ্ঞ রাজনীতিকের কাজ। মাঠকর্মী হিসেবে শুরু করে নেতৃত্বের আসনে ওঠে আসা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার কারণে বঙ্গবন্ধু মানুষের পালস্ যেভাবে বুঝতেন, আমাদের দেশের কম রাজনীতিকই সেভাবে বুঝতে পারতেন। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী যখন পাকিস্তানিদের উদ্দেশে 'আস্সালামুয়ালাইকুম' বা বিদায় জানান, তখন বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে আতাউর রহমান

খান সরকারের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে (মে ১৯৫৭) সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং পাকিস্তানিদের উদ্দেশে বিদায় ঘোষণা করতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করেছেন। আবার বাঙালির জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে সঠিক সময়ে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি নিয়ে হাজির হলেন, যদিও সে সময়ে স্বয়ং আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতৃত্বের অনেকেই এর পক্ষে ছিলেন না। বঙ্গবন্ধু যে তাঁর সিদ্ধান্তে সঠিক ছিলেন, ইতিহাস তার প্রমাণ।

অনুরূপভাবে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পর কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বামপন্থী কর্মীদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক যুবলীগের কর্মসূচি প্রণয়ন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রথমে মতবিরোধ, পরে বিচ্ছেদ দেখা দেয়। বঙ্গবন্ধু যেখানে 'সম্প্রদায়িক মিলন'ই একমাত্র চেষ্টা হওয়া উচিত বলে মনে করেছেন, সেখানে বামপন্থী কর্মীরা 'প্রকৃত স্বাধীনতা আসে নাই' বলে ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের পক্ষে ছিলেন। এ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেন:

> দুই মাস হল দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন [অন্য] কোন দাবি করা উচিত হবে না। মিছামিছি আমরা জনগণ থেকে দূরে সরে যাব...আমাদের দেশের কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন সহকর্মীরা... এই সকল কর্মসূচি নিয়ে এখনই জনগণের কাছে গেলে আমাদের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলবে এবং যে কাজ এখন বিশেষ প্রয়োজন, সাম্প্রদায়িক মিলনের কথা বললেও লোকে আমাদের কথা শুনতে চাইবে না (*আত্মজীবনী*, পৃ. ৮৫)।

কমিউনিস্টদের প্রসঙ্গে *আত্মজীবনী*র অন্যত্র বঙ্গবন্ধু বলেন:

> এদের আমি বলতাম, "জনসাধারণ চলেছে পায়ে হেঁটে, আর আপনারা আদর্শ নিয়ে উড়োজাহাজে চলছেন। জনসাধারণ আপনাদের কথা বুঝতেও পারবে না, আর সাথেও চলবে না। যতটুকু হজম করতে পারে ততটুকু জনসাধারণের কাছে পেশ করা উচিত" (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১০৯)।

ঠিক একই কারণে, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার সময় শুরুতে এ দুই সংগঠনের নামের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল বটে, তবে কয়েক বছরের মধ্যেই নাম থেকে তা বাদ দেয়া হয়, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, তিনি ছিলেন সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এবং এ সব প্রশ্নে আপোসহীন। এ ব্যাপারে তাঁর জীবন থেকে বহু উদাহরণ দেয়া যাবে। তবে তাঁর *আত্মজীবনী*তে ব্যক্ত ঘটনাবলির মধ্য থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বদান এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। কর্মচারীদের সার্বিক অবস্থা বঙ্গবন্ধু এভাবে তুলে ধরেন:

> পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেসিডেন্সিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন এটাই পূর্ব বাংলার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্র অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কর্মচারীদের সংখ্যা বাড়ে নাই। তাদের সারা দিন ডিউটি করতে হয়। পূর্বে বাসা ছিল, এখন তাদের বাসা প্রায়ই নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কারণ নতুন রাজধানী হয়েছে, ঘরবাড়ির অভাব। এরা পোশাক পেত, পাকিস্তান হওয়ার পরে কাউকেও পোশাক দেওয়া হয় নাই। চাউলের দাম ও অন্যান্য জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। চাকরির কোনো নিশ্চয়তাও ছিল না। ইচ্ছামত তাড়িয়ে দিত, ইচ্ছামত চাকরি দিত (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১১২)।

বঙ্গবন্ধু সে সময়ে আইন বিভাগের ছাত্র ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের সঙ্গে শুধু যুক্তই হননি, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের নেতৃত্বও গ্রহণ করেন। ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য তাদের পরামর্শ দেন। ধর্মঘট চালিয়ে যেতে অর্থ তুলে সহায়তা করেন। কর্মচারীদের আন্দোলনের কারণে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে ১৭ই এপ্রিল ১৯৪৯ পুনরায় খুললে, ঐ দিন ধর্মঘটসহ প্রতিবাদ-সমাবেশ আয়োজন করেন। কর্মচারীদের বিষয় নিয়ে উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাধিক দিন বৈঠক করেন। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া ও তাতে সক্রিয় ভূমিকা পালনের কারণে ২৫ জন ছাত্র ও ২ জন ছাত্রীর[২] বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে ছাত্রলীগ এবং ছাত্রলীগের সভ্য নন এমন শীর্ষ স্থানীয় ছাত্র নেতাদের কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বন্ড দিয়ে আন্দোলন থেকে নাম প্রত্যাহার করে ছাত্রত্ব বজায় রাখেন। বঙ্গবন্ধুর নিজের পনের টাকা জরিমানার (অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার) অর্থ পরিশোধ করা দূরে থাকুক, বরং তিনি ছাত্রলীগের যে দুই শীর্ষস্থানীয় নেতা যথা নঈমউদ্দিন আহমদ (কনভেনর) ও আবদুর রহমান চৌধুরী (ভিপি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল) এরূপ বন্ড দিয়েছেন, তাদের তৎক্ষণাৎ সংগঠন থেকে বহিষ্কার করে প্যামপ্লেট ছাপিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতরণের বন্দোবস্ত করেন। এরপর ১৯শে এপ্রিল উপাচার্যের বাসভবনে কিছু ছাত্র নিয়ে অবস্থান ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধু স্বয়ং পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন (বিস্তারিত, *আত্মজীবনী*, পৃ. ১১১-১১৭)।[৩] এভাবে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবনের অবসান ঘটে।

তিনি নিঃসন্দেহে পনের টাকা জরিমানা পরিশোধ করে অন্যদের মত ছাত্রত্ব বজায় রাখতে পারতেন। কিন্তু তা হতো নিজের ব্যক্তিস্বার্থে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা। সেটি কোন অবস্থাতেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নয়। তিনি কর্মচারীদের আন্দোলনকে ন্যায়সঙ্গত বলে দৃঢ়ভাবে মনে করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে ছাত্রদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন হলে না-হয় কথা ছিল, কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন ও নেতৃত্বদানের কারণে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবনের অবসান, এত বড় ত্যাগ! এটিই হলো বঙ্গবন্ধুর নীতি-আদর্শ ও শিক্ষা।

বঙ্গবন্ধু তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজনীতির শীর্ষে ওঠে আসেন। এটি কিছুতেই সহজসাধ্য ছিল না। এজন্য তাঁকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়। এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ১৯৭২ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "... চোঙ্গা মুখে দিয়ে রাজনীতি করেছি, রাস্তায় হেঁটেছি, পায়ে হেঁটেছি, ফুটপাতে ঘুমিয়েছি।" "বাংলাদেশে এমন কোন মহকুমা নেই, এমন কোন থানা নেই, যেখানে আমি যাইনি।"[৪] বঙ্গবন্ধুর

আত্মজীবনী গ্রন্থেও এর একাধিক প্রমাণ মিলে। যেমন, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি লঙ্গরখানা খুলে মানুষকে বাঁচাতে যেভাবে কাজ করেন, তার বর্ণনা এভাবে দেন:

> ... লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অনেকগুলি লঙ্গরখানা খুললাম ... দিনভর কাজ করতাম, আর রাতে কোনোদিন বেকার হোস্টেলে ফিরে আসতাম, কোনোদিন লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে থাকতাম (*আত্মজীবনী*, পৃ. ১৮)।

১৯৪৬ সালে কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গার সময় শহরের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয়া মানুষের মধ্যে খাদ্য পৌঁছে দেয়ার জন্য দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজে চাল বোঝাই ঠেলাগাড়ি ঠেলেছেন (পৃ. ৬৬)। ১৯৪৬ সালে আবুল হাশিমের সম্পাদনায় বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসেবে *সাপ্তাহিক মিল্লাত* বের করা হলে, বঙ্গবন্ধু রাস্তায় হকারি করে ঐ পত্রিকা বিক্রি করেছেন (পৃ. ৪০)। রাজনীতি করার খরচ মেটানোর উদ্দেশ্যে ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার পার্ক সার্কাসে রেস্টুরেন্ট দিয়েছিলেন (পৃ. ৮২, ৮৫)। দেশ ভাগের পূর্বে সোহরাওয়ার্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় ও আবুল মনসুর আহমদের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকার তিনি কিছুকাল পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি হয়েছিলেন (পৃ. ৮৮)। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ঢাকা চলে আসেন এবং ১৫০ মোগলটুলী পার্টি হাউজে এসে ওঠেন। সেখানে একটি কক্ষে তিনি অপর এক বন্ধুর সঙ্গে বেশ কয়েক বছর থাকেন। এ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু *আত্মজীবনী*তে লিখেন:

> ... সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা এলাম। পূর্বে দু'একবার এসেছি বেড়াতে। পথ ঘাট ভাল করে চিনি না। আত্মীয়স্বজন, যারা চাকরিজীবী, কে কোথায় আছেন, জানি না। ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে প্রথমে উঠব ঠিক করলাম। শওকত মিয়া মোগলটুলী অফিসের দেখাশোনা করে। মুসলিম লীগের পুরানা কর্মী। আমার বন্ধুও। শামসুল হক সাহেব ওখানেই থাকেন... ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করলাম, ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে পৌছে দিতে... (*আত্মজীবনী*, পৃ. ৮৩)।

বঙ্গবন্ধু যে ভবিষ্যতে বড় মাপের নেতা হবেন, তা কৈশরেই বুঝা যাচ্ছিল। ১৯৩৮ সালে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর গোপালগঞ্জ আগমন উপলক্ষে গঠিত ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর তিনি প্রধান ছিলেন। গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলে পড়ার সময় তিনি স্কুলের ক্যাপ্টেন, গরিব মুসলমান ছাত্রদের কল্যাণার্থে গঠিত মুসলিম সেবা সংঘ, স্থানীয় মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগ ডিফেন্স কমিটির তিনি সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের পক্ষে ফরিদপুর অঞ্চলের নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালের ৭ই জুলাই অনুষ্ঠিত সিলেটের গণভোটেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। দেশ বিভাগের পূর্বে রাজনীতি বা সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে অধিষ্ঠিত না হলেও, নিজ কর্মদক্ষতা গুণে রাজনৈতিক অঙ্গণে তিনি হয়ে ওঠেন এক সুপরিচিত নাম। শুধু কলকাতা নয়, এর বাইরেও জেলা শহরে। একজন ত্যাগী, কর্মঠ, ভাল কর্মী হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। তিনি *আত্মজীবনী*তে লিখেন, 'আমাকে

যে কাজ দেওয়া হত আমি নিষ্ঠার সাথে সে কাজ করতাম .... ভীষণভাবে পরিশ্রম করতে পারতাম' (পৃ. ৩৭)।

বঙ্গবন্ধু নীতি ও আদর্শভিত্তিক রাজনীতি, রাজনৈতিক দল ও দলের ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। কেননা, নীতি ও আদর্শ বিবর্জিত কোন দল বা দলের ঐক্য টিকেও থাকে না, দেশ ও জনগণের কল্যাণে কিছু করতেও পারে না। বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এই বিশ্বাস নিয়েই এগিয়েছেন। ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের পূর্বে তাঁর দলের এবং বাইরের কিছু নেতা শেরে বাংলার নেতৃত্বাধীনে সে সময়ে সৃষ্ট কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বধীন নেজাম-ই-ইসলাম ইত্যাদি দলের সঙ্গে মুসলিম লীগ-বিরোধী ঐক্যফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব করলে, প্রথমে বঙ্গবন্ধু এর ঘোর বিরোধিতা করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'যাদের নীতি ও আদর্শ নাই তাদের সাথে ঐক্যফ্রন্ট করার অর্থ হল কতকগুলি মরা লোককে বাঁচিয়ে তোলা' (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২৪৮)। তিনি আরও বলেন, "নামও শুনি নাই এমন দলের আবির্ভাব হল। হক সাহেব খবর দিলেন, 'নেজামে ইসলাম পার্টি' নামে একটা পার্টি ... তাদেরও যুক্তফ্রন্টে নিতে হবে ... আমি বললাম, "ঐ পার্টি কোথায়, এর প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি কারা? সংগঠন কোথায় ...?" (পৃ. ২৫২)

যাহোক, সিনিয়র নেতাদের পীড়াপীড়ি এবং পক্ষে এক ধরনের জনমত গড়ে ওঠায় অবশেষে বঙ্গবন্ধু 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনে সম্মত হলেও, "যুক্তফ্রন্ট করলে ক্ষমতায় যাওয়া যেতে পারে, তবে জনসাধারনের জন্য কিছু করা সম্ভব হবে না, আর এ ক্ষমতা বেশি দিন থাকবেও না। যেখানে আদর্শের মিল নাই সেখানে ঐক্যও বেশি দিন থাকে না" (পৃ. ২৫০) মর্মে যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, ৫৪-র নির্বাচন-উত্তর তা কীভাবে সত্যি প্রমাণিত হয়েছিল, তা সবার জানা রয়েছে। এমনকি, যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসেবে শেরে বাংলার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ অনাস্থা প্রস্তাব পর্যন্ত আনতে বাধ্য হয়েছিল (পৃ. ২৮৮)।

১৯৬২ সালে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কয়েকটি বিরোধী দল নিয়ে আইয়ুব-বিরোধী রাজনৈতিক মঞ্চ, ন্যাশনাল ডিমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা এনডিএফ গঠিত হলে, ওপরে উল্লিখিত একই নীতি ও আদর্শের কারণে বঙ্গবন্ধু ঐ জোট থেকে বের হয়ে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর এক মাস বিশ দিন পর (২৫শে জানুয়ারি ১৯৬৪) ধানমন্ডির নিজ ভবনে সভা ডেকে এনডিএফ থেকে বের হয়ে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নীতি ও আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ছাড়া বাঙালির জাতীয় মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। '৬০-এর দশকে বাঙালির মুক্তিসনদ, 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা' কর্মসূচি ঘোষণা করে (৫-৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬) অবিশ্বাস্য গতিতে আওয়ামী লীগকে বাঙালির জাতীয় মুক্তির মঞ্চে পরিণত করতে সক্ষম হন, যে দলের নেতৃত্বে পরবর্তীকালে আমরা আমাদের স্বাধীনতা লাভ করি।

সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, অসীম আত্মবিশ্বাস, গভীর দেশপ্রেম ও ত্যাগের মানসিকতার পাশাপাশি মানুষের ভালবাসা বঙ্গবন্ধুকে স্বীয় স্থানে পৌছে দেয়। এখানে একটি ঘটনার

কথা উল্লেখ করতে হয়, যা তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। ঘটনাটি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময়। বঙ্গবন্ধু ঐ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী ও বহু অর্থের মালিক ওয়াহিদুজ্জামান ওরফে ঠাণ্ডা মিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও জয়ী হন। বঙ্গবন্ধু স্মৃতিচারণ করে *আত্মজীবনী*তে লিখেন:

> ... খুবই গরিব এক বৃদ্ধ মহিলা কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, শুনেছে এই পথে আমি যাব, আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বলল, "বাবা আমার এই কুঁড়েঘরে তোমায় একটু যেতে হবে।" আমি তার হাত ধরেই তার বাড়িতে যাই ...আমাকে মাটিতে একটা পাটি বিছিয়ে বসতে দিয়ে এক বাটি দুধ, একটা পান ও চার আনা পয়সা এনে আমার সামনে ধরে বলল, "খাও বাবা, আর পয়সা কয়টা তুমি নেও, আমার তো কিছুই নাই।" আমার চোখে পানি এল... সেই পয়সার সাথে আরও কিছু টাকা তার হাতে দিয়ে বললাম... টাকা সে নিল না, আমার মাথায় মুখে হাত দিয়ে বলল, "গরিবের দোয়া তোমার জন্য আছে বাবা।" নীরবে আমার চক্ষু দিয়ে দুই ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়েছিল... সেইদিনই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, 'মানুষেরে ধোঁকা আমি দিতে পারব না।' ... আমি ... জানতাম না, এ দেশের লোক আমাকে কত ভালবাসে। আমার মনের একটা বিরাট পরিবর্তন এই সময় হয়েছিল (*আত্মজীবনী*, পৃ. ২৫৫-২৫৬)।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক মহান আদর্শবান নেতা। বাঙালির জাতীয় মুক্তি ও গণমানুষের কল্যাণে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। অসাম্প্রদায়িকতা ছিল তাঁর নিঃশ্বাসে-বিশ্বাসে। তিনি সবসময় জনগণের ও সংগঠনের শক্তিতে আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর দৃঢ়, প্রাজ্ঞ, গণভিত্তিক, বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বঙ্গবন্ধু মুজিব চিরঞ্জীব।

তথ্যনির্দেশ

১. ১৯৭৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, মোনায়েম সরকার ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *রক্তমাখা বুকজুড়ে স্বদেশের ছবি*, বঙ্গবন্ধু পরিষদ ১৯৮২, পৃ. ৮৮।

২. এরা হলেন, লুলু বিলকিস বানু (আইনের ছাত্রী) ও নাদিরা বেগম (এমএ ক্লাসের ছাত্রী। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও মুনীর চৌধুরীর ভগ্নি)।

৩. আরো, অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি*, পৃ. ৮৪-৮৮।

৪. মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, ঢাকা ১৯৮৯, পৃ. ১১৪, ১৯৮।